খুলনায় জামায়াত-চরমপন্থী ভাই ভাই

GK mgq Pigcš’x‡`i AZ¨vPv‡i Ljbvi gvbl wQj mš¿¯|
GLb ÔRvgvZ-wkweiÕ Zv‡`i‡KI nvi gvbv‡”Q| G wel‡q ckvmb wbweKvi| wbweKvi wbewPZ miKvi...

wj‡L‡Qb সাজেদুর রহমান

◄ weGj K‡j‡Ri wZZgxi n‡ji cwðg cv‡ki ev_i“gwU wkwe‡ii UPvi †kj

খুলনার নামকরা বিএল কলেজটি ব্রজলাল বাবু ১৯০২ সালে শুধু হিন্দুদের জন্য স্থাপন করেছিলেন। কালক্রমে এই বিশ্ববিদ্যালয় কলেজটি দক্ষিণবঙ্গের খ্যাতনামা বিদ্যাপীঠে পরিণত হয়। কিন্তু জ্ঞানচর্চার বদলে রাজনীতির আখড়া হিসেবে গড়ে তোলার সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য নিয়ে বিএল কলেজে অনুপ্রবেশ করে ছাত্র শিবির। ১৯৯০ সালে ছাত্র সংসদ নির্বাচনে পূর্ণ প্যানেলে শিবির জয়ী হলে মৌলবাদী গোষ্ঠীর তৎপরতা শুরু হয়। এরপর বিগত ১৪ বছর ধরে একবারের জন্যও কলেজটি শিবিরের হাতছাড়া হয়নি। সেই বিএল কলেজের তিতুমির হলের দ্বিতীয় তলার পশ্চিম পাশের বাথরুমটি তাদের টর্চার সেল। এখানে তারা তাদের দলের ভেতরকার মতবিরোধীদের শারীরিক নির্যাতন চালায়। বাথরুমটার ভেতরের দেয়ালে লালকালো রক্তের ছোপ সেই নির্যাতনের সাক্ষী দেয়।

দেয়ালে লেগে আছে মাকড়োসার জাল আর লাল লাল রক্তের ছোপ

খুলনায় শিবির শুধু বিএল কলেজকে দখলে রাখেনি, বর্তমান সরকারের আমলে তা বিস্তৃত করে কমার্স কলেজ, সিটি কলেজ, দিবানৈশ কলেজ, পলিটেকনিক কলেজ, হাজি মোহাম্মদ মুহসীন কলেজসহ সবকটি মাদ্রাসায় বিস্তৃত করেছে। বড় বড় কলেজ ও মাদ্রাসা দখলের পর এখন তারা নজর দিয়েছে শহরের বিভিন্ন স্কুলগুলোতে। বিস্ময়ের ব্যাপার, শিবিরের তৎপরতা এখন প্রাইমারি ও কিন্ডারগার্টেন পর্যন্ত বিস্তৃত করেছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের তারা 'ফুলকুঁড়ি' নামে শিবিরের অঙ্গ সংগঠন হিসেবে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

বিএল কলেজে ভর্তি হতে হলে শিবির হতে হবে

'বিএল কলেজের মাটি/শিবিরের ঘাঁটি'। ভর্তিচ্ছুক ছাত্রছাত্রীকে পদে পদে বুঝে নিতে হয় উক্ত স্লোগানটির মর্মকথা। ভর্তির ফরম কলেজ কর্তৃপক্ষ দেয় না, দেয় শিবির কর্মীরা। ভর্তির নিয়ম কানুন, ভর্তির একাধিক গাইড, কোচিং এবং ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল ও পাশকৃতদের ফরম পূরণ করে ক্লাসের রেজিস্ট্রেশন খাতা পর্যন্ত শিবিরের কর্মীরাই নিয়ন্ত্রণ করে। এসব ক্ষেত্রে কলেজের শিক্ষক-কর্মচারীরা সব সময়ই শিবিরের মুখাপেক্ষী। কলেজের একজন সিনিয়র কর্মচারী জানালেন, ভর্তি ফরম এলে পুরো বাক্স সুদ্ধই শিবিরের নেতারা নিয়ে যায়। ভর্তি পরীক্ষার খাতা সব স্যারেরা দেখতে পায় না। শিবিররা যেসব স্যারের নামের লিস্ট দেবে শুধু তারাই খাতা দেখে পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করে। তবে বর্তমানে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন নিয়ম করায়, ওরা বেশ বিপাকে আছে। তারপরেও তারা নানারকম অপচেষ্টা চালায়।

বিএল কলেজে ৭টি ছাত্রাবাস। একমাত্র সুবোধ চন্দ্র ছাড়া সব কটিই শিবিরের পূর্ণ দখলে। মুহসীন ও শামসুন্নাহার হল দুটিতে মেধাভিত্তিক বন্টনের প্রচলন থাকলেও শিবির সবকটিই নামে বেনামে দখল করে রেখেছে। শহীদ তিতুমির ও মুহসীন হল দুটিতে শিবিরের ক্যাডাররা থাকে। কলেজ শাখার সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক হল দুটির প্রধান দায়িত্বে থাকে। হলগুলোর নামাজের স্থান ও কমনরুম শিবিরের অফিস রুম। বিশ্বস্ত সূত্র মতে জানা যায়, হলে দুটির ৪/৫টি রুম সব সময় তালাবদ্ধ থাকে। বন্ধ রুমগুলোতে গরাণ কাঠ, হকি, লাঠি, রাম দা, গুলতি থাকে। এছাড়াও হলের বিভিন্ন রুমে কালো ব্যাগে বোম ও লকারগুলোতে বিভিন্ন ধরনের আগ্নেয়াস্ত্র থাকে।

শিবিরের দাপটের কাছে কলেজের শিক্ষক ও সাধারণ ছাত্ররা জিম্মি। এজন্য অনেক হিন্দু শিক্ষক ও ছাত্র ইসলামী জলসায় ও দাওয়াতি কার্যক্রমে অংশ নিতে বাধ্য হয়। কলেজের একজন ভিন্ন ধর্মাবলম্বী সিনিয়র শিক্ষক জানালেন, 'এবার বিজয় দিবসটাও আমরা করতে পারিনি। এছাড়াও ২১শে ফেব্রুয়ারির দিনেও তারা সহিংস ঘটনা ঘটিয়েছে। কলেজের স্মৃতিসৌধ ভাঙচুর

করেছে। ওদের বিরুদ্ধে কোনো কথা বলা যায় না। আগে বিরোধী দলে থাকায় তাদের কার্যক্রম এতো উদ্ধত ছিল না। কিন্তু বর্তমানে সরকারি দল হওয়ায় এরা চরম উগ্র হয়ে উঠেছে।'

শুধু বিএল কলেজের ক্যাম্পাসই নয়, কলেজের আশপাশের এলাকাতেও শিবির ও জামায়াতের প্রভাব আছে। কলেজ সংলগ্ন এলাকা কাশিপুরে শিবিরের প্রায় ৫০টির মতো মেস আছে। এছাড়া এসব এলাকায় দেড় শতাধিক শিবির কর্মী বিভিন্ন বাড়িতে লজিং থাকছে। কাশিপুরের স্থানীয় এক বাসিন্দা জানালেন, 'এই শিবিরের ছেলেরা এলাকায় বিয়ে করছে দেদারছে। যে বাড়িতে লজিং থাকছে সে বাড়ির মেয়েকেই বিয়ে করছে। এমন ঘটনা এখানে নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার।' কাশিপুর ছাড়াও দৌলতপুর, দেয়ানা, পাবনা, রায়মহল, বয়রা, গাইকুর শিবির ও জামায়াতের প্রভাব বেড়েছে। তবে মূল সংগঠন জামায়াতের চেয়ে ছাত্র সংগঠন শিবিরের প্রভাব ও দৌরাত্ম্যই অনেক বেশি। জামায়াত নেতারা ব্যস্ত অভিনব কায়দায় অর্থ আদায়ে। এদেরই একজন জামায়াতে ইসলামের খুলনা শ্রমিক কল্যাণ সভাপতি শফিকুল আলম। সে দলীয় নায়েবে আমির। শফিকুল জাতে বিহারি। ভাষায় তাই ছ ও স'র ব্যবহার বেশি। তার ভাষায়, 'আমাদের এলাকায় প্রধান ছমছ্যা হলো মিলগুলিন বন্ধ হয়ে যাওয়া। আমি সরকারি দল করি, তারপরেও প্রধানমন্ত্রীকে চিঠ্ঠি দিয়েছি।

খালিশপুরের নিউজপ্রিন্ট, দৌলতপুর জুটমিল, হার্ডবোড মিলগুলো বন্ধ হওয়া প্রসঙ্গে সে সাপ্তাহিক ২০০০কে এ কথাগুলো বলছিল। খালিশপুরের পাটকলগুলোতে খোঁজ নিয়ে জানা যায়, মিলের শ্রমিক নেতাদের সঙ্গে আঁতাত করে শফিকুল এক বিশেষ ব্যবসা করে। খালিশপুরস্থ প্লাটিনাম, পিপুলস ও ক্রিসেন্ট জুটমিলে শ্রমিকদের সপ্তাহান্তে পারিশ্রমিক দেয়ার রেওয়াজ। অথচ এই নিয়ম পালন করা হয় না। সপ্তাহ শেষে মিলের কর্তৃপক্ষ টাকা নেই বলে একটা স্লিপ ধরিয়ে দেয়। দৈনিক ৭০ টাকা হিসেবে ৪৯০ টাকা ও অতিরিক্ত সময় হিসেবে আরো ২/৩ শ' টাকাসহ মোট ৬ থেকে ৭ শ' টাকার একটা স্লিপ ধরিয়ে দিয়ে কর্তৃপক্ষ বলে, মিলে টাকা এলে স্লিপ দেখিয়ে নিয়ে যেও। দরিদ্র শ্রমিকরা অপেক্ষা না করে বাধ্য হয়ে বাইরে বিশেষ এক শ্রেণীর লোকদের কাছে ২০ থেকে ৩০ শতাংশ কমে ওই স্লিপ বিক্রি করে দিয়ে নগদ অর্থের সংস্থান করে। শফিকুল আলম হচ্ছে ওই বিশেষ শ্রেণীর মানুষ যারা ওই স্লিপ কেনে। এই স্লিপ দেখিয়ে তারা পরে মিল থেকে টাকা তুলে। শফিকুল আলম অবশ্য এসব ঘটনায় তার সংশ্লিষ্টতা অস্বীকার করে বলেন, শ্রমিক নেতা ও মিলের অসাধু কর্মকর্তারা এভাবে শ্রমিকদের ঠকাচ্ছে।

সূর্যের চাইতে বালির তাপ বেশি

খুলনা মহানগরীর জামায়াতের আমির মিয়া গোলাম পরোয়ার খুলনা ৫ আসনের সাংসদ। তিনি এলাকায় যত না দাপটে নেতা, তার চাইতে বহুগুণ দাপট দেখায় তার ছোট ভাই মিয়া গোলাম কুদ্দুস। আফিল জুট মিল দখল, স্থানীয় ১০/১২টি চিংড়ি ঘের দখলসহ বিভিন্ন স্থানে টেন্ডারবাজি করে থাকে। কুদ্দুসের ত্রাসে ফুলতলা, শিরমণি, দামোদর বেজের ডাঙ্গা, ডুমুরিয়া, জুগনি পাশা, পায়গ্রাম কসবার হাজার হাজার মানুষ সন্ত্রস্ত। এবারের কুরবানির সময় অত্র এলাকায় ৪টি হাটই কুদ্দুসের ছিল একক নিয়ন্ত্রণ। জানা গেছে, কুদ্দুসের সবচে' বড় শক্তি পূর্ববাংলা কমিউনিস্ট পার্টি এমএল-এর সক্রিয় শক্তি শৈলেন। শৈলেনের ভাই প্রতাপ কুদ্দুসের চিংড়ি ঘের দেখাশোনা করে। এছাড়াও কুদ্দুস

'আমরা চরমপন্থি চিনি না। আমরা দল করি, দলের চোখে সবই সমান'

তরিকুল ইসলাম পিকু
শিবিরের মহানগরের সেক্রেটারি

সাপ্তাহিক ২০০০ : আপনারা এখন কি নিয়ে ছাত্র সমাজের মধ্যে কাজ করছেন?

তরিকুল ইসলাম পিকু : আমরা এখন ১১ মার্চ বিএল কলেজ ভর্তি নিয়ে ভাবতেছি। এবার যে কি দিয়ে কি হবেনি তা বোঝা যাছ্ছে না।

২০০০ : ঘোলাটে মনে হচ্ছে?

পিকু : ছাত্রদল এবার সবখানেই বাগড়া দিছ্ছে, বুঝতে পাছ্ছেন। সিটি কলেজে তাগো জন্য নির্বাচন হলো না। এবার বিএল কলেজেও একটা ঝামেলা বাদাতি পারে। বিশেষ করে ওগো কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য নাজমুল হুদা চৌধুরী এক নম্বরে ঘিরিঙ্গিবাজ। মঞ্জু গ্রুপ আবার আমাগোর সঙ্গে মিলমিস করে থাকে।

২০০০ : বিএল কলেজসহ খুলনার অনেক কলেজেই শিবিরের প্রভাব...

পিকু : যে জমিনে শিবিরের একজন কর্মীর রক্ত ঝরে বুঝতে হবি সেহানে শিবিরের দখলে। খুলনায় আমাগেরে হালিম, রহমত, কাশেমের রক্ত ঝরছে, তাই এহেনে শিবিরের দখলে।

২০০০ : বিএল কলেজে বোমা বানাতে গিয়ে বিস্ফোরণে ২ জনের মৃত্যু হয়, একজন আহত হয়। ওরা কারা ছিল?

পিকু : ওগে চিনি নে। কোনো দুষ্কৃতকারিরা ঘটাইছে।

২০০০ : কলেজ ছাত্ররা বলল, ওরা আপনাদের দলের।

পিকু : কারা কল? আন্দাজে কয়। আর একটা কথা, মারা গেছে একজন, দুইজন না।

২০০০ : স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন যে জানালো ২ জন এবং ওরা আপনাদের কর্মী।

পিকু : পুলিশরা কি জানে। আমরা সারাদিন থাহি আমরা জানি না?

২০০০ : গত বছর বিজয় দিবস পালন করতে বাধা দিয়েছেন আপনারা...

পিকু : বুঝলেন ভাই এগুলো হলো তথ্যসন্ত্রাস। আমাগে বিরুদ্ধে তথ্যসন্ত্রাস। বিজয় দিবসে বিজাতীয় কায়দায় নাচগান করবে এইডা তো আমরা করতি দিতি পারি না। আমরা একটা আদর্শিক সংগঠন। আমাদের সামনে যে যা ইচ্ছা করতি পারে না।

২০০০ : আহমদিয়া সম্প্রদায়ের মসজিদের সাইনবোর্ডের ওপর সাইনবোর্ড টাঙায়ছেন কেন?

পিকু : খ্রিস্টানদের গোয়েন্দা ওরা। ওরা মুসলমান নাহি! তাই ওগো ওইডা যে মসজিদ না উপাসনালয় তারই সাইনবোর্ড বসায়ছি।

২০০০ : সারা খুলনা শহরে আপনাদের কতগুলো মেস আছে।

পিকু : এইডা কওয়া যাবে না।

২০০০ : শোনা যায় ওসব ছাত্রাবাসে অনেক অপড়ুয়া যুবকও থাকে। অনেকে বলে ওরা চরমপন্থি গ্রুপের সঙ্গে জড়িত?

পিকু : চরমপন্থি বুঝি না। আমাগো পন্থি যারা তারাই থাকে।

২০০০ : ছোট শিশুদের মধ্যে আপনারা ফুলকুঁড়ি নামে সংগঠনের নামে রাজনৈতিক তৎপরতা চালাচ্ছেন, এটা কি ঠিক?

পিকু : এইডার উত্তর আমি দিমু না। আর একটা কথা এই বিষয়ে পত্রিকায় কিন্তু লিখবেনও না। আর এমন কথা লিখবেন না যেন আমার কাছে ফোন আসে মনে রাখবেন।

২০০০ : আর একটা প্রশ্ন করব। চরমপন্থিদের সঙ্গে আপনাদের সম্পর্কের বিষয়টা একটু বলুন।

পিকু : আমরা চরমপন্থি চিনি না। আমরা দল করি, দলের চোখে সবই সমান।

শৈলেনের মাধ্যমে মাদকদ্রব্য ও অস্ত্র ব্যবসা করে থাকে বলে খুলনা বারের একজন অ্যাডভোকেট জানায়। অন্যদিকে এদের ছোটভাই মুজাহিদুল ইসলাম বিএল কলেজের শিবিরের সেক্রেটারি। অন্য দুই ভাই মনজুর ও খায়ের জামায়াত-শিবির রাজনীতির সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত।

সেনা সদস্য দিয়ে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা!

সোনাডাঙ্গ বাসটার্মিনাল থেকে অনতিদূরে আল ফারুক সোসাইটি। এই প্রতিষ্ঠানটিকে বাইরে থেকে মাদ্রাসার মতো দেখালেও ভেতরটা অন্যরকম। দোতলা ভবনের নিচতলা মাদ্রাসার আদলে চেয়ার-টেবিল থাকলেও ওপরতলা প্রশিক্ষণ ক্যাম্প। ক্যাম্পে শিবির ও জামায়াতের কর্মীদের তিন থেকে ৭ দিনের সামরিক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। অভিযোগ রয়েছে, এই প্রশিক্ষণ দিতে, অবসরপ্রাপ্ত সেনা সদস্যরা এসে থাকেন। প্রশিক্ষণে শারীরিক কসরত ও অস্ত্র চালানো শেখানো হয়। সাউন্ড প্রুফ রুমে নির্দিষ্ট দূরে বোর্ডে মানব আকৃতির ছবিতে গুলি ছুঁড়ে নিশানা ঠিক করা হয়। এসব কাজের দেয়ালে গুলির গর্ত ও চিহ্ন রয়েছে। এছাড়া শিবিরের আরো কয়েকটি স্থানে এ ধরনের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা আছে। এগুলোর মধ্যে আছে মুজগুন্নির নেছারিয়া মাদ্রাসা, দৌলতপুরের কবি ফররুখ একাডেমী, খালিশপুরের শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন, নিরালার চৌধুরী লজসহ ৫/৭টি স্থানে।

স্কুলগুলোতে ইসলামী বই পড়তে বাধ্য করা হয়

মহেশ্বর পাশা কেএম উচ্চ বিদ্যালয়ে গিয়ে দেখা যায় বিদ্যালয়ের লাইব্রেরির তাকে ইসলামী রাষ্ট্র ও সরকার পরিচালনার মূল নীতি, ইসলাম ও আধুনিক চিন্তা, দি ইন্ডিয়ান মুসলমানসহ হাজার খানিক বই। স্কুলের একজন শিক্ষক জানালেন, স্থানীয় শিবিরের নেতারা প্রতি সপ্তাহের বৃহস্পতিবার ছাত্রদের নিয়ে বসে। সেখানে প্রকাশ্যেই রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে কথা হয়। এসব বিষয়ে শিবিরের কাউকেই কিছু বলা যায় না। তারা শিক্ষকদেরকেও বাধ্য করে ওই সব শিবিরের নেতাদের সহায়তা করাতে। মূল পাঠ্যবইয়ের পাশাপাশি শিবিরের নিজস্ব বইগুলোকেও ছাত্রদের পড়তে বাধ্য করে। মহেশ্বরপাশা কে এম উচ্চ বিদ্যালয়ই শুধু নয়, খালিশপুরের রোটারী স্কুল, জেলা স্কুলসহ নগরীর বিভিন্ন স্কুলগুলোতে এইরকম ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা বাধ্য করছে। এই ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা বাধ্য করা বিষয়ে শিবিরের মহানগরী সভাপতি শামসুর রহমান জানান, 'শুধু স্কুলগুলোতেই নয়, নতুন গড়ে ওঠা রূপসা কলেজ, জিয়া কলেজসহ বেশ কটি কলেজেই এই ব্যবস্থা চালু হয়েছে।'

চরমপন্থী জামায়াত-শিবির ভাই ভাই

Pigcš‡`i mv‡_ Rvgv‡Zi m¤úK© wb‡q ¯'vbxq Gqvc wgqv †Mvjvg c‡ivqvi e‡jb, 'না। আমরা সরকারি নিষিদ্ধ কোনো চরমপন্থিদের সঙ্গে কোনো প্রকার যোগাযোগ মেইনটেইন করে চলি না।' wZwb Pigcš'x †bZv ˆm‡j‡bi mv‡_ m¤ú‡Ki K_vI A¯'xKvi K‡ib| A¯'xKvi K‡ib wbe©vPb ceK ˆm‡j‡bi mnvqZvi K_v| রূপসাভিত্তিক ক্যাডার আব্দুর রশিদ মালিথা ওরফে তপন জনযুদ্ধের সর্বোচ্চ নেতা। তপন গত নির্বাচনে চারদলীয় জোটের পক্ষে কাজ করে। গত ২০০২ সালের জানুয়ারিতে খুলনার আদালতের বারান্দা থেকে জামায়াতের সহায়তায় তপন ছিনতাই হয়। সেই ছিনতাইয়ে শিবিরের ক্যাডার শানু নেতৃত্ব দেয়। ছিনতাইয়ের পরপরই তপন জনযুদ্ধ নামের নতুন একটি চরমপন্থী সংগঠন গঠন করে। জনযুদ্ধ সংগঠনটি খুন-দখলসহ নানা অপকর্ম এত বেশি করে যে খুব দ্রুত সবচেয়ে দাপুটে চরমপন্থী সংগঠন হয়ে ওঠে। শোয়েব-সুমন দুই ভাই চরমপন্থী দল করলেও গোপনে শিবিরকে সহায়তা করত। শোয়েব ছিল তপনের ডান হাত।

জামায়াত শিবিরের সঙ্গে খুলনা, ডুমুরিয়া, রূপসা, আড়াঙ্গঘাটা, ফুলতলাসহ বিভিন্ন এলাকার চরমপন্থীদের যোগসাজশ আজ প্রকাশ্য ব্যাপার হয়ে গেছে। শিবিরের অনেক সাথী-সদস্য চরমপন্থী দলের উচ্চ পর্যায়ের নেতা। তেমনি একজন ওয়াসিমুল বারী। প্রকাশ্যে সে ওয়াসিম হিসেবেই পরিচিত ছিল। অপরপক্ষে চরমপন্থী পূর্ববাংলা কমিউনিস্ট পার্টি এমএল-এর সে ছিল খুলনার উচ্চ পর্যায়ের ক্যাডার। চরমপন্থী গ্রুপে তার নাম ছিল টিপু। গত বছর রোজার ঈদের তিন দিন পর চুয়াডাঙ্গার চেঙ্গুটিয়া ইটভাটার পাশে টিপু ওরফে ওয়াসিমের বিকৃত লাশ পাওয়া যায়। বিশ্বস্ত সূত্রে জানা যায়, টিপুর ওপর দায়িত্ব ছিল নওয়াপাড়ার আওয়ামী লীগ নেতা রাজ্জাককে মারার। কিন্তু টিপু তাকে একাধিকবার চেষ্টা করে মারতে পারেনি বিধায় চরমপন্থীরা শেষে টিপুকেই মেরে ফেলে।

অপরদিকে গত নির্বাচনে গোলাম পরোয়ারের হয়ে কাজ করে পূর্ববাংলা কমিউনিস্ট পার্টির অপর নেতা শৈলেন। শৈলেনের মাধ্যমে পরোয়ার তার আসনে ডুমুরিয়ায় হিন্দু অধ্যুষিত এলাকাগুলোতে নির্বাচনী প্রচারণা চালায়।

এছাড়াও পূর্ববাংলার সাবেক নেতা কামরুল গাজি ছিল শিবিরের অস্ত্র যোগানদারদের একজন। কামরুল গাজি ভাই-ভাতিজা এরা সবাই এখনও জামায়াত ও শিবিরের সক্রিয় কর্মী।

গণ মানুষের মুক্তির কথা বলে যেসব চরমপন্থী দলগুলোর উত্থান, সেগুলোই এখন মদদ দিচ্ছে জামায়াত শিবিরকে। এক সময় এসব আন্ডারগ্রাউন্ড পার্টির অত্যাচারে খুলনায় মানুষ ছিল সন্ত্রস্ত। এখন জামায়াত-শিবির যোগ দেয়ায় সাধারণ মানুষের ন্যূনতম নিরাপত্তা নেই। প্রশাসন নির্বিকার। নির্বিকার নির্বাচিত সরকার।

এক নজরে খুলনার শিবির

খুলনা মহানগরীতে শিবিরের বার্ষিক আয় ৫০ থেকে ৬০ লাখ টাকা। গত বছর তাদের বিভিন্ন খাত থেকে আয় হয়েছে ৫৭ লাখ ৪৮ হাজার টাকা।

■ বিভিন্ন কলেজের ভর্তি গাইড বিক্রি করে আসে ১০ লাখ ৭০ হাজার। ■ সেই সঙ্গে ভর্তি কোচিং করিয়ে আসে ৫ লাখ ৫৫ হাজার। ■ বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের কাছ থেকে ইয়ানত বাধ্যতামূলক চাঁদা আসে ৫ লাখ ৮৮ হাজার। ■ কলেজের বাইরে বিভিন্ন ছাত্রাবাস থেকে ইয়ানত আসে ১ লাখ ৬৮ হাজার। ■ ছাত্রাবাস ছাড়াও এলাকা ভিত্তিক শিবির কর্মীদের থেকে ২ লাখ ২৭ হাজার। ■ ডায়রি, ক্যালেন্ডার, স্টিকার ও পুস্তিকাসহ নানারকম প্রকাশনা থেকে আসে ৬ লাক ৪০ হাজার। ■ পদ্মা, যমুনা, মেঘনাসহ বিভিন্ন পেট্রোল পাম্প থেকে আসে ৮ লাখ ১০ হাজার। ■ বিভিন্ন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান থেকে আসে ৬ লাখ ৯০ হাজার। ■ দেলোয়ার হোসেন সাঈদীর ওয়াজ মাহফিলের জন্য বছরে এককালীন বিশেষ চাঁদা আসে ৪ লাখ টাকা। ■ খুলনায় শিবিরের সদস্যদের মৃত্যুবার্ষিকী পালন উপলক্ষে চাঁদা আদায় হয় ৫ লাখ টাকা। ■ 'বায়তুল মাল' নামের বিশেষ চাঁদা থেকে আদায় হয় ১ লাখ টাকা।

গত এক বছরে বিএল কলেজের ঘটনা : ১২ জানুয়ারি ২০০৪ মুহসীন হলের ছাদে বোমা বানাতে গিয়ে দু'জনের মৃত্যু। একজন আহত। মৃতেরা পাবলার স্থানীয় শিবির কর্মী। ■ ২ ফেব্রুয়ারি ২০০৫ বিএল কলেজের প্রশাসনিক ভবন ও শত বর্ষপূর্তি স্মৃতিস্তম্ভে বিক্ষুব্ধ শিবির কর্মীরা ভাংচুর করেছে। ■ ১৬ ডিসেম্বর ২০০৪ বিজয় দিবস অনুষ্ঠানে শিবিরের তান্ডবে কলেজ কর্তৃক আয়োজিত অনুষ্ঠান ভন্ডুল।

বিএল কলেজকেন্দ্রিক ৯টি খুন : ১. মুক্তি ১৯৯১ সালে শিবিরের এক সংঘর্ষে পুলিশ শিবিরের ক্রসফায়ারে মারা পড়ে। ২. মুন্সি আব্দুল হালিম ১৯৯২ ছাত্রদলের সঙ্গে সংঘর্ষে মারা যায়। ৩. শিবির কর্মী রহমত একই দিনে মারা যায়। ৪. কাশেম পাঠান ১৯৯৩ ছাত্রদলের সঙ্গে সংঘর্ষে মারা পড়ে। ৫. ছাত্রদলে মহানগরের সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ ১৯৯৪ সালে শিবিরের হাতে খুন হয়। ৬. ছাত্রলীগের বিএল কলেজ শাখার আহ্বায়ক লিপন ১৯৯৯ শিবিরের ষড়যন্ত্রে চরমপন্থী দ্বারা খুন হয়। ৭. ছাত্রদলের বিএল কলেজ শাখার সাধারণ সম্পাদক রফিকুল ইসলাম ১৯৯৬ খুন হয়। ৮. ১৯৯২ সালে শিবির কর্মী আমিনুল ইসলাম বিমান ঘাতকদালাল কমিটির এক মিছিলে সামনে পড়ে যায়। গণ ধোলাইয়ে মারা যায়। ৯. আমান ১৯৯২ সালে ছাত্রদল-শিবির সংঘর্ষে মারা যায়।